B.A (GEN) BENGALI (CBCS)
SEM- 6 DSE-1B : প্রবন্ধ ও ভ্রমণকাহিনি
Debayan Chaudhuri, Assistant Professor, Dept. of Bengali
Shahid Matangini Hazra Govt. College for Women
Chakshrikrishnapur, Kulberia, Purba Medinipur

ক. চাচা কাহিনী (নির্বাচিত)- সৈয়দ মুজতবা আলী

চাচা কাহিনী ও নাৎসিবাদ

'চাচা কাহিনী' এমন এক রচনা যাতে সমকালীন দেশ কালের ছাপ যেমন আছে, তেমনই সাহিত্যের শর্ত মেনেই তা চিরন্তন আবেদন বজায় রেখেছে। সৈয়দ মুজতবা আলী ছিলেন বহু ভাষাবিদ এবং পৃথিবীর প্রচুর জায়গায় তিনি ভ্রমণ করেছিলেন। জীবনের বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন জায়গার অভিজ্ঞতা ফুটে উঠেছে তাঁর লেখায়। কাবুলে অধ্যাপনার সুবাদে তিনি লিখে ফেলেন 'দেশে- বিদেশে'র মতন বই। আমরা জানি জার্মান বৃত্তি নিয়ে সৈয়দ মুজতবা আলী প্রথমে বার্লিন এবং পরে বন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। সময়কাল ১৯২৯- ১৯৩২। ১৯৩৩ সালে তিনি জার্মানি থেকে ফিরে এসেছিলেন। এই সময়ের প্রতিফলন আমরা পাই আলোচ্য গ্রন্থে। সবচেয়ে বড়ো কথা তিনি যে সময়ে জার্মানিতে ছিলেন সে সময়ে জার্মানীতে জাতীয়তাবাদ চরম আকার নিয়েছে। সৌজন্যে অ্যাডলফ্ হিটলার। জন্ম ২০ এপ্রিল, ১৮৮৯। জন্মসূত্রে অস্ট্রিয়ান এই রাজনীতিবিদ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সৈনিক হিসেবে যোগদান করেছিলেন। বিশ্বযুদ্ধ শেষে প্রতিষ্ঠিত হয় National Socialist German Workers' Party সংক্ষেপে NAZI বা নাৎসি। ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫ সময়কালে জার্মানি নাৎসি পার্টির অধীনে ছিল এবং ফিউরার বা নেতা হিসেবে ছিলেন হিটলার। এইসময় জার্মানি ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রে পরিণত হয়। নাৎসি দলের ২৫ দফা কর্মসূচীর মধ্যে অন্যতম ছিল বর্ণবাদ- বিশেষত ইহুদী বিদ্বেষ। জার্মান জনগণ নিজেদের আর্য জাতির বংশধর হিসেবে ভাবতে থাকে। অন্য জাতিদের ওপর আঘাত নেমে আসে। হিটলারের বিরুদ্ধ স্বর যে কোনো মূল্যে স্তব্ধ করা হতে থাকে। ভার্সাই সন্ধির তীব্র নিন্দা করে, চরম ইহুদি বিরোধিতার মধ্য দিয়ে, জার্মান জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক বৃহৎ রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনার মাধ্যমে হিটলার ও নাৎসি দল মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিল।

জার্মানিতে সমাজতান্ত্রিক ও ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধাচারণ এবং ইহুদি বিতাড়ন ছিল তাদের লক্ষ্য। নর্ডিক জাতির শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্য রক্তমিশ্রণকে তারা এড়িয়ে চলতো সচেতনভাবেই। জাতির পবিত্রতা বজার রাখার একরকম সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা কাজ করেছিল সেসময়। সৈয়দ মুজতবা আলীর 'চাচা কাহিনী'-তে নাৎসিদের কথা এসেছে স্বাভাবিকভাবেই। দেশপ্রেমের যে ধ্বজা উড়িয়ে উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রচার ও প্রসার তার কিছুটা আঁচ পাওয়া যেতে পারে 'কর্নেল' রচনায়।

এই লেখার প্রথমেই লেখক বার্লিনের দুরবস্থার কথা বলছেন- " ১৯১৪- ১৮- এর শ্মশান-ফেরত বার্লিন ১৯২৯-এও পৈতে উল্টো কাঁধে পরছে, এবং তাই গরীব ভারতীয়দের পক্ষেও সম্ভবপর হয়েছিল কুরফুর্স্টেন্‌ডামের গা ঘেঁষে উলান্ডস্ট্রাসের উপর আপন রেস্তোরা 'হিন্দুস্তান হৌস' পত্তন করার। " আর এই 'হিন্দুস্থান হৌসের সবচেয়ে বড় আড়কাঠি ছিলেন চাচা'। একদিন আড্ডায় শ্রীধর মুখুজ্যে জানান- বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপকের গীতা পড়ানোর সময় বলেছেন বর্ণসঙ্কর না হলে কোনো জাতির উন্নতি হয় না। এই থেকে প্রমাণ করা যায় গীতার প্রথম অধ্যায় গুপ্তযুগে লেখা। কেননা বর্ণসঙ্করের জুজু নাকি বৌদ্ধ যুগের আগে ছিল না। বর্ণসঙ্করের জুজুর সূত্র ধরেই এরপর চাচা মূল গল্পে প্রবেশ করেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানিতে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়। এইসময় ফন্ ব্রাখেল কর্নেল ডুটেন্‌হফারের পরিবারকে সাহায্য করবার মনোবাসনা নিয়ে বিদেশি মুদ্রা উপার্জনের জন্য চাচাকে পেয়িং গেস্ট হবার পরামর্শ দেন। সঙ্গে এটাও জানিয়ে দেন যে চাচার উপকার করবার ভাব যেন প্রকাশ না পায়। চাচা যেন বলেন তিনি প্রাশান কর্নেলের কাছে উচ্চাঙ্গের জার্মান ভাষা পড়বার জন্যে আশ্রয়প্রার্থী হয়েছেন। কর্নেল যখন জানতে পারলেন চাচা জার্মান বলতে জানেন, তারপর থেকে আর ইংরেজি বলেননি কোনোদিন। এক বছর ধরে কর্নেল গ্যেটে পড়ালেন জাতীয়তাবাদী পদ্ধতিতে- "এককথায় জর্মান দৃষ্টিবিন্দু থেকে তামাম ইয়োরোপের সংস্কৃতি- সভ্যতার সর্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস। পূর্ণ এক বৎসর ধরে গ্যেটের গোষ্পদে ইয়োরোপের শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গড়েওঠা ইতিহাস-ঐতিহ্য বিম্বিত হল।" শুধুমাত্র গ্যেটে পড়াবার মধ্যে কর্নেলের জাতীয়তাবাদী পরিচয়ের আভাস পাওয়া যায়। তিনি চাইতেন প্রাশান কৌলীন্য যাতে বজায় থাকে। অথচ তা যেন দম্ভপ্রসূত না হয়। সবার সঙ্গে পার্থক্য বজায় রাখার মধ্যে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ধারণা যেমন তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, তেমনই তিনি চাইতেন যাতে রক্তসংমিশ্রণ না ঘটে। রক্তসংমিশ্রণ ঠেকাবার জন্য প্রাণবিসর্জন চাচার কাছে বাড়াবাড়ি ঠেকলেও আমরা এর থেকে নাৎসি জার্মানির খোঁজ পেতে পারি। কর্নেলের কথার মধ্যে ফ্রান্স বিরোধিতা স্পষ্ট হয়েছে। কাহিনির পরত খুলতে খুলতে চাচা জানিয়ে দেন ফ্রাউ ডুটেন্‌হকার-এর মর্মান্তিক জবানিতে- " আমাদের পরিবারের কথা কখনো পাড়বেন না। আমাদের ষোল বছরের ছেলেটি

ফ্রান্সের লড়াইয়ে মারা গেছে, আমাদের মেয়ে--"। যে সমস্যা মানুষের মনকে আন্দোলিত করে তা নিয়ে মানুষ সাধারণভাবে আলোচনা করে কিন্তু হের ওবের্স্ট কখনো সে বিষয়ে কথা বলেননি।

একদিন কলেজ থেকে ফিরে চাচা দেখলেন একটি যুবতী পেরেমবুলেটরের হ্যান্ডেলে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অঝোরে কাঁদছেন। চেহারা কর্নেলের মত ভারি সুন্দর। কথায় বুঝতে পারলেন এই মেয়েটি তাঁদের কিন্তু কর্নেল তাঁকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন ফরাসি অধ্যাপককে বিয়ে করার অপরাধে। চাচা সমস্ত দ্বিধা ত্যাগ করে মেয়েটির পক্ষ নিয়ে কর্নেলের স্ত্রীকে অনুরোধ করলেও কোনো কাজ হয় না। তিনি পাথরের মত বসে আছেন। প্রাশান এটিকেট লঙ্ঘন করেই যেন চাচা মেয়েটিকে বাড়ি পৌঁছে দিলেন এবং তাঁর ঠিকানা টুকে নিয়ে এলেন। এসে টেবিলের ওপর যে চিঠি দেখতে পেলেন তাতে অবিলম্বে বাড়ি ছাড়ার নির্দেশ। চাচা কর্নেলের বাড়ি ছাড়ার এক বছরের মধ্যে কর্নেল মারা যান। আর এই সময় তিনি কোনো পেয়িং গেস্ট রাখেননি, প্রায় উপবাসে মৃত্যু বরণ বলা চলে। জাতিগত বিদ্বেষের কারণে তিনি মেয়েকে কাছে রাখলেন না। এদিকে পুত্র যুদ্ধে মারা গিয়েছিল। দেশ ও জাতির প্রশ্নে নিজের সন্তান বিসর্জন এবং সন্তানশোক সহ্য করবার মধ্য দিয়ে দেশপ্রেমের এক ছবি ফুটে ওঠে। রক্তের বিশুদ্ধতা বজার রাখার সংকল্প সেখানে মানবিকতাকে হারিয়ে দেয়। নাৎসি দলের আদর্শ কীভাবে একটি পরিবারের জীবনে ছাপ ফেলেছিল, এই গল্পটি তাঁর প্রমাণ হতে পারে। চরম এবং মর্মান্তিক সে আখ্যান। হৃদয় থাক আর নাই থাক, প্রতিজ্ঞার যেখানে অন্যথা হয় না।

'কর্নেল' গল্পে নাৎসিবাদ প্রকাশের মধ্যে একজন মানুষের দেশপ্রেমের পরিচয় পেয়েছি আমরা। আর যেসময় এই গল্পটি লেখা সে সময় নাৎসিবাদ তার স্বরূপ নিয়ে ভয়ার্ত করেনি পৃথিবীর শান্তিপ্রিয় মানুষকে। 'কর্নেল' গল্পের রক্ষণশীল দেশপ্রেম যেন পরবর্তীকালের নগ্ন জাতীয়তাবাদের রূপ ধারণ করেছে 'বেলতলাতে দু-দুবার' গল্পে। এই গল্পের প্রথমে লেখক জানাচ্ছেন- " নাৎসিদের প্রতাপ দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। আড্ডার তাতে কোনো আপত্তি নেই, বরঞ্চ খুশি হবারই কথা। নাৎসিরা যদি একদিন ইংরেজের পিঠে দু-চার ঘা লাগাতে পারে তাতে অন্তত এ আড্ডার কেউ বেজার হবে না। বেদনাটা সেখানে নয়, বেদনাটা হচ্ছে দু- একটা মূর্খ নাৎসিকে নিয়ে। ফর্সা ভারতীয়কে তারা মাঝে মাঝে ইহুদি ভেবে কড়া কথা বলে, আর এক নাক- বাঁকা নীল- চোখো কাশ্মীরীকে তারা নাকি দু- একটা ঘুষিঘাষাও মেরেছে। " ১৯২৯ –এর অর্থনৈতিক মন্দা জাতির জীবনকে যে তছনছ করে ফেলেছিল সে কথা আমরা আগেই জেনেছি। ইহুদি বিতাড়ন করলেই এ দেশের মানুষেরা স্বর্গরাজ্য পেয়ে যাবে এই ভাবনা গ্রাস করেছিল যুবসমাজকেও। দলে দলে তারা নাৎসি সমর্থক হয়ে যাচ্ছিল। এই গল্পের মূল চরিত্র অস্কারের

কথা এনেছেন লেখক সেদিনের আড্ডায়। ইংরেজ এবং জার্মানরা যুদ্ধে পরস্পরের বিরোধী ছিল, আবার লেখক ইংরেজের উপনিবেশের মানুষ। এই গল্পে সাম্রাজ্যবাদী দেশ এবং উপনিবেশের মানুষের অভিজ্ঞতার এক আশ্চর্য রসায়ন ফুটে ওঠে লেখকের মুন্সিয়ানার মধ্য দিয়ে, রম্য রচনার আড়ালে অন্ধ জাতীয়তাবাদের বিপদজনক দিকটিও অবলীলায় ধরা দেয় পাঠকের চোখে। মিউনিকের মাইল পনেরো দূরে এক ছোট্ট গ্রামে যে বাড়িতে লেখক থাকতেন, সেই মুদির সংসারের বড়ো ছেলে অস্কার। অস্কার শিল্প রসিক এবং মাতাল। আঠারো বছর বয়সে চাকরি পেয়ে প্রতি রাতেই বিয়ার খেয়ে সকালে মদ ছাড়ার শপথ নিয়েছে। এইভাবেই বয়স বাইশে ঠেকেছে। অস্কার ছিল পাঁড় নাৎসি। চাচা একদিন তাকে জিজ্ঞেস করেন- 'নাৎসি পার্টিতে টাকা ঢালছো কেন?' এর উত্তরে সে জানায়–'তাই দিয়ে বন্দুক- পিস্তল কিনে বিদ্রোহ করবে, তারপর ফাঁসিতে ঝুলবে বলে।' কিংবা চাচার মনে হয়েছিল মিশনারিদের আফ্রিকায় ধর্মপ্রচার বন্ধ করে দেওয়া উচিত। কিন্তু অস্কার বলে বসে- "তাহলে দুর্ভিক্ষের সময় বেচারী নিগ্রোরা খাবে কী? মিশনরির মাংস উপাদেয় খাদ্য!" অস্কারের কথাবার্তা থেকেই স্পষ্ট বিদ্বেষবোধ। চাচার সঙ্গে অস্কারের অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল, কিন্তু সে সম্পর্কে ছেদ পড়ে। একদিন রবিবার সকালে অস্কারের বোন চেঁচিয়ে খবর কাগজ পড়ছিল যেই অংশে নাৎসি পতাকা দেখে মাথা নত না করায় এক ইহুদিনীকে নাৎসিদের প্রহারের কথা বর্ণিত হয়েছে। নাৎসি গুন্ডাদের সম্পর্কে লেখক বিরক্তি প্রকাশ করলে অস্কার জিজ্ঞেস করে- " জাতির পতাকার সম্মান যারা বাঁচাতে চায় তারা গুন্ডা?" চাচা কিছু বলার আগেই অস্কারের বুড়ো বাবা উত্তর দিয়ে দেন – " ওটা জাতির পতাকা হল কী করে? ওটা তো নাৎসি পার্টির পতাকা।' দু- এককথাতেই চাচা ইহুদিদের সমর্থন করেন কিনা এই প্রশ্ন তুলে বসে। চাচা প্রশ্নটিকে অবান্তর বললে অস্কার বলে চলে- " প্রশ্নটা মোটেই অবান্তর নয়। ইহুদীরা যতদিন এদেশে থাকবে ততদিনই বর্ণসঙ্করের সম্ভাবনা থাকবে। জর্মনির নর্ডিক জাতের পবিত্রতা রক্ষা করতে হবে"। এরপর চাচা বর্ণসঙ্করের ধারণাকে খণ্ডন করে বলেছেন ভারত কিংবা জার্মানির প্রাচীন সভ্যতা সংস্কৃতি আর্য অনার্য সভ্যতার সংমিশ্রণ। এই কথা শুনে অস্কার আরো ক্ষেপে যায়। খাঁটি আর্যত্বের প্রশ্নে অটল অস্কার হুঙ্কার তুলে চাচাকে বলে- " আপনি বলতে চান, আমাদের সুপারম্যানরা সকলেই বাস্টার্ড?" সেদিনের কথোপথনের পর এক বছর কেটে গিয়েছে। র‍্যোনডর্ফের সাম্বৎসরিক মেলা উপস্থিত। বুড়োবুড়ি এবং মারিয়া নেমন্তন্ন করতে এসেছেন। চাচার দ্বিধার কারণ বুঝতে পেরে মারিয়া জানিয়েছে এ কদিন অস্কারের সঙ্গে দেখা হলেও সে চিনতে পারবে না কেননা অস্টপ্রহর ছুটি নিয়ে সে বিয়ার খায়। কীভাবে তার সঙ্গে চাচার দেখা হল এবং এক অর্থে ত্রাণকর্তা হয়ে উঠল অস্কার, সে সম্পর্কে পাঠকমাত্রই অবগত আছেন। তবে এই অংশেও নাৎসিবাদী উপস্থিত। নাৎসির প্রেমিকা চাচার প্রতি মুগ্ধ হলে যে

কৌতুকের সৃষ্টি হয় তার মধ্যেও শোনা যায় – " যত সব ইহুদি আর বাদ বাকি কালা- আদমি নেটিভরা এসে এদেশের মানইজ্জৎ নষ্ট করে ফেললো! এই করেই বর্ণসঙ্কর হয়...দেশটা অধঃপাতে যাচ্ছে..." ইত্যাদি ইত্যাদি। সবচেয়ে বড়ো কথা মিথ্যে দোষারোপের স্বপক্ষে সে দু-একজনের সায় পাচ্ছে। চাচার প্রতি জনতার দৃষ্টিও পাল্টে গেছে। সামাজিক মনস্তত্ত্বের এক অব্যর্থ নিদর্শন পাই এই লেখায়। নাৎসি ড্রাগনের হাত থেকে চাচাকে নাৎসি অস্কার উদ্ধার করলেও বিজাতীয় হিসেবে ততক্ষণে জোর শিক্ষা হয়ে গেছে চাচার। গল্পটির শেষে এক কপোতির প্রশ্নে চাচার চম্পটের কথা আছে। হাসির মোড়কে এই গল্পে নাৎসিদের অন্ধ জাতিবিদ্বেষ এবং নর্ডিক জাতির পবিত্রতা রক্ষার ভুল ধারণাকে তুলে ধরা হয়েছে। এই রচনা তৎকালীন নাৎসিপ্রভাবিত জার্মানির বিশ্বস্ত দলিল হয়ে ওঠে। কোনো এক দলের পতাকা যে জাতির পতাকা নয় এই বোধ আজকের সময়েও প্রাসঙ্গিক।

'কর্নেল' গল্পে নাৎসিবাদের তত্ত্বের প্রকাশ দেখা গেছে বেশি সেখানে 'বেলতলাতে দু'দুবার' গল্পে যেন তারই ব্যবহারিক প্রয়োগ। কর্নেল স্থির, শান্ত, প্রাজ্ঞ। অস্কার ততটাই অসংযত। দুইজনের বয়সের ব্যবধানও লক্ষ করার মতো। আলাদা আলাদা প্রজন্ম কীভাবে নাৎসিবাদের শিকার, লেখক কী সেটা দেখাতে চেয়েছেন নাকি দুটি গল্পের সময়ের ব্যবধান মানসিকতার পরিবর্তনকে সূচিত করে। কর্নেল চরিত্রের যন্ত্রণা অস্কারের চরিত্রে নেই। কর্নেল নিজের মৃত্যুকে নিজের জেদের বশে ত্বরান্বিত করেছেন। অস্কারের অল্প বিস্তর গুণ থাকলেও নেশায় তা দূরীভূত হয়েছে। আদতে কোনো মনোভাব যখন অন্ধত্বের পর্যায়ে পৌঁছে যায়, মানবিকবোধ থেকে মানুষ ক্রমশ দূরে চলে যেতে থাকে। কল্পনার ফানুস মানুষকে প্রমত্ত করে তোলে। আর এর লাভ নিতে থাকে জাতীয়তাবাদী নেতারা। রক্ষণশীল দেশপ্রেমের আগ্রাসী জাতীয়তাবাদী রূপ নেওয়ার ছবি হয়তো লেখক এই দুটি গল্পের মাধ্যমে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন। সেই সঙ্গে নাৎসিবিরোধী স্বরের প্রস্তাবনা কিংবা প্রশ্নের অবতারণা 'চাচা কাহিনী'কে বহুস্বরিক করে তোলে।

.....

BENGALI (CBCS)/ SEM- 6 / DSE-1B : **প্রবন্ধ ও ভ্রমণকাহিনি/ চাচা কাহিনী**
Debayan Chaudhuri, Assistant Professor, Dept. of Bengali
Shahid Matangini Hazra Govt. College for Women, Purba Medinipur